যৌথ সেচ ব্যবস্থার একটি অসমাপ্ত প্রয়াসঃ
বাদ পড়ে যাওয়া মানুষগুলি কি বাদই পড়ে থাকবেন?

ধ্রুবজ্যোতি ঘোষ

পশ্চিম বাংলায়, কিংবা বলা যায় পূর্ব ভারতে, পুরুলিয়া জেলার একটা আলাদা আকর্ষণ আছে। এখানকার ভাষা, এখানকার ভূপৃষ্ঠের গড়ন, নদী, জঙ্গল, সাঁওতালদের গ্রাম, বাড়ি, আর তার দেওয়ালে দেওয়ালে আঁকা ছবি, এই সবই অনুসন্ধানি মনকে টানে। এখানকার মানুষের অনেকের মধ্যে একটা মানভূম অঞ্চলের অহংকার আছে। চমৎকার মজার মজার গল্প আছে মূলবাসীদের নিয়ে। গানবাজনা আর নাচ তো এখন অনেকেরই জানা। কিন্তু অনেকেই যেটা জানেন না তা হল এই জেলাতেই তিরিশটির ওপর মাঝারি সেচবাঁধ আছে। আমার জানা নেই ভারতবর্ষের কোন খরাপ্রবণ জেলায় এতগুলি মাঝারি সেচবাঁধ আছে কিনা। যদিওবা থাকে, তাও খুব বেশি সংখ্যক জেলায় তা থাকতে পারে না।

আমার পুরুলিয়ার যাতায়াত এই সেচবাঁধ নিয়ে ভাবনাচিন্তা, আর গবেষণা করারই তাগিদে। ২০০৭ সাল থেকে। সুযোগ করে দিয়েছিলেন তদানিন্তন সেচমন্ত্রী এবং সেচ সচিব। কিছু সময়ের জন্য প্রাথমিক কাজকর্মের পরে মনে হয়েছিল যে এই সেচ প্রকল্পগুলিতে সেচসেবিত এলাকার কৃষক সমাজের সাথে সেচ দপ্তরের ইঞ্জিনীয়ার তথা কর্মচারিদের সম্পর্ক যথাযথ নয়। মনে হয়েছিল যে এদের মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়া যতদিন পর্য্যন্ত না যথাযথ হবে ততদিন অন্তত দুটো ক্ষতি ঠেকানো যাবেনা। প্রথমতঃ প্রচুর পরিমাণে জল চুরি এবং দ্বিতীয়ত দরিদ্রতম কৃষক পরিবারের এক বিরাট অংশ, যারা এমনিতেই বাদ পড়ে গেছেন বিকাশের সুযোগ-সুবিধা থেকে, তাঁরা কোনও দিনও জল পাবেন না যা দিয়ে তাঁরা চাষ করতে পারবেন। তাই আবেদন করেছিলাম যৌথ সেচ ব্যবস্থা চালু করা নিয়ে পরিক্ষা-নিরীক্ষা করার। আবেদন মঞ্জুর হয়েছিল। সেচমন্ত্রী কথায় - বার্তায় সতত সঙ্গে ছিলেন।

প্রথমে কাজ শুরু করেছিলাম কুমারী সেচ প্রকল্পে। এর কমান্ড এলাকা ৪৫০০ হেক্টরের কাছাকাছি। সর্বমোট –– চাষী এখানে বসবাস করেন। অর্ধেকের কাছাকাছি উপযুক্ত জল পান না চাষের। সর্বদা এজন্য নয় যে জল নেই। জল পান না কারণ জলের বিতরন ব্যবস্থা পক্ষপাতদুষ্ট এবং কৃষকের প্রয়জনের সাথে তাল রাখে না বলে। এটাও ঠিক যে খালের নিচের দিকের বিশাল অংশে জল পৌঁছাতো না, যেমন সব বাঁধেই প্রায় হয়। ভাল কথা যে দেরিতে হলেও, খালের শেষ পর্য্যন্ত জল গড়িয়ে যাওয়ার কাজটি সেচ দপ্তর সেরে ফেলতে পেরেছেন। যদি সময় মত, প্রয়োজন মত জল যায় তবে কিছু চাষী তার সুবিধে পেতে পারেন কয়েক বছরের মধ্যেই।

১. গোড়ার কথা

সঠিক হিসেব করে বলতে গেলে, **পশ্চিম বাংলায় মাঝারি বাঁধে যৌথ সেচ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার চেষ্টার এটাই সূত্রপাত।** কুমারী কমান্ড এলাকায় প্রায় ১৮ কি মি খাল চালু করা বাকি পড়ে ছিল। এর প্রায় পুরোটাই চালু হয়ে যাবে। সামনের বছর খালের নিচু এলাকার কৃষকরা এর সুবিধে পেতে শুরু করবেন। কিন্তু খাল কাটা শেষ হলেই কমান্ড এলাকায় সেচের যাবতীয় সমস্যা মিটে যাবে তো? জল ভাগ-বাটোয়ারায় কোনও বিরোধ হবে না তো? যদি সত্যি-ই তাই হত, তবে আমাদের এই গবেষণার কোনও দরকার হত না। এমন দৃষ্টান্তেরও কোন অভাব নেই যেখানে খাল কাটার কাজ শেষ হবার পরও সেচ ব্যবস্থা আশানুরুপ হচ্ছে না, বা জলের সদ্ব্যবহার বলতে যা বোঝায় তা হচ্ছে না।

আমরা সেচ ব্যবস্থাকে সমস্ত গ্রাম জীবনের অংশ হিসেবে দেখতে চাই। গ্রামের পরিবেশ তথা প্রাকৃতিক ভারসাম্যের প্রশ্নগুলির সঙ্গে একই সাথে দেখতে চাই। অর্থাৎ একই সঙ্গে আরো বড় ছবিটাকে দেখতে চাই। যদি গ্রামের মানুষের আচরণ, তাঁদের জ্ঞান, তাঁদের সিদ্ধান্ত নেবার পদ্ধতি - এর প্রত্যেকটিতে গুরুত্ব না দেওয়া হয়, তাহলে সরকারের প্রচলিত চেষ্টা সত্ত্বেও সেচ ব্যবস্থা আশানুরূপ ফল দেবে না। আমরা কৃষকদের তথা গ্রামবাসীদের সিদ্ধান্ত নেবার গুণগত মান অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে যাচাই করে দেখতে চাই। দেখতে চাইছি গ্রামের মানুষ কিভাবে সিদ্ধান্ত নেন। কখনও পরিবেশ তথা প্রাকৃতিক ভারসাম্যের কথা ভাবেন কিনা, প্রশ্ন তোলেন কি না। আরো দেখতে চাইছি কায়দা করে নিচুতলার মানুষদের সিদ্ধান্ত নেওয়ার পদ্ধতি থেকে বাদ দেওয়া হয় কিনা। এটাও ঠিক যে গ্রাম সংসদ স্তরে গড়াপেটা সিদ্ধান্ত কোথাও হয় না, একথা বুক ঠুকে আজ কেউ-ই বলতে পারবে না। এ ধরণের কোনও চালাকি বা ফাঁকিবাজি থাকলে আমরা সেসব বুঝতে চাইব।

কুমারী কমান্ড এলাকায় আমরা কি দেখলাম? এই এলাকার কিছু কিছু গা-সওয়া ঘটনা আমাদের ভুলতে সময় লাগবে। এই ঘটনাগুলির উপর দাঁড়িয়ে আমরা আমাদের এগনোর পথ খোঁজার চেষ্টা করছি। এখানে আজও খালের উপর দিকে কিছু কৃষক ইচ্ছেমত নালা কেটে নিজের খেতে জল নেবেন, যথেচ্ছ নষ্ট করবেন আর তাই নিচের তলার বহু কৃষক জলের জন্য হাহাকার করে দিন কাটাবেন, জল পাবেন না। খড়েয়া শবররা নিচু জাত তায় তথাকথিত উচ্চজাতির ঈশ্বর শাবকেরা তাঁদের ইদারা থেকে শবরদের খাবার জল তুলতে দেবেন না। আর তাই শবররা ক্যানালের জল তুলে পান করবেন, পেটের অসুখে ভুগবেন, ভুগেই যাবেন। ওঁদের হয়ে বলবার কইবার কেউ নেই তাই ওঁদের উন্নয়নের টাকা বেমালুম ফেরৎ চলে যাবে। এই বাদ পড়ে যাওয়া মানুষগুলির নিজেদের জীবনের প্রতি চরম উদাসীনতার সুযোগ নিয়ে আর কতদিন আমরা 'যেমন চলছে চলুক' - এই সুবিধাজনক উর্দিটা পরে কাটিয়ে দিতে পারবো - আমরা এই প্রশ্নটা সামনে আনতে চাইছি।

প্রশ্ন উঠতে পারে যৌথ সেচ ব্যবস্থার প্রকল্পের পুস্তিকায় বাদ পড়ে যাওয়া মানুষের কথা পেড়ে আনার কী দরকার। আমাদের উত্তর - যদি আদৌ কেউ সাহস করে প্রশ্ন করেন - তবে তাঁদের দিকে তাকিয়ে আমরা বলছি যে আমরা 'যৌথ' কথাটার সদর্থ করতে চাইছি। সদর্থেই ব্যবহার করতে চাইছি। যৌথ মানে টাকার বিনিময়ে সিদ্ধান্ত কিনে নেওয়া নয়, গরিষ্ঠতা প্রমাণের চালাকি নয়, যৌথ অর্থে সবাইকে নিয়ে, সবার জন্যে, সবার দ্বারা।

২. আমরা কোথায় জোর পেলাম?

আমরা এত জোর দিয়ে এ কথাটা বলছি কিভাবে? বলছি কারণ 'যৌথ' কথাটার ধারণাটা আমরা খুব পরিষ্কার করে বুঝতে পেরেছি বা এখনও বুঝছি পুরুলিয়ার বাগমুন্ডি ব্লকের একটি প্রাচীন সেচ ব্যবস্থার সঙ্গে কাজ করে। এই সেচব্যবস্থা বুড়দা গ্রামে 'ষোল আনা' নামে আজও পরিচালিত হচ্ছে। পাহাড় যখন সমতলে এসে মেশে, তখন যেমন উঁচু নিচু থাকে জমির পিঠটা ঠিক তেমনিই বুড়দার ভূপৃষ্ঠ। এইখানেই আশি বছরের উপর চালু আছে ষোলো আনা সেচ ব্যবস্থা। কমবেশী দুশোটি পরিবার এই ব্যবস্থায় সামিল আছেন।

গ্রামে একজন ঢোল বাজান। তাঁর নাম 'গড়াইৎ'। 'গড়াইৎ' তার নিজের নাম নয়। ওটা ওর পদাধিকারের নাম। যেমন মাস্টারমশায় বা থানার বড়বাবু। সেই রকমই।

গড়াইৎ কখন ঢোল বাজান? পুজোতে, পালায় পার্ব্বনে না গ্রামের যাত্রায়? কোথাও নয়। গড়াইৎ ঢোল জারি করেন বছরে বার দু-এক। সারা গ্রাম জুড়ে জানান দেন এক অদ্ভুত ঘটনার কথা। 'গ্রামবাসী তোমরা সবাই অবগত হও যে আগামী অমুক তারিখে সকল গ্রামবাসীদের নিয়ে সভা হবে বুড়দা সকল গ্রামবাসীদের ষোলো আনার খাল সারাইয়ের কাজে নেমে পড়তে হবে। ডুম,ডুম,ডুম,ডুম,ডুম..... ।

না এই উপরের ঘটনাটা একটুও গল্প নয়। আগেকার দিনের কোনো ঘটনার বিবরণও নয়। একেবারে প্রতিবছর চোখের সামনে ঢোল পেটাতে পেটাতে গড়াইৎ মশাই তাঁর খাল সংস্কারের বক্তব্য জানিয়ে তামাম গ্রামকে সচকিত, অবহিত করে তোলেন। ঠিক কতবছর আগে থেকে এটা হচ্ছে এখনই তা বলা যাবে না। লিখিত তথ্য নেই সম্ভবত। তবুও ৮০ বছরের ওপর ধরে যে ঢোল জারি হয়ে আসছে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

আমরা যাদের পেয়েছি তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে যিনি বয়োজ্যেষ্ঠ তাঁর নাম ললিত মোহন শান্ডিল্য - বয়স ছিল ১০৫। অথচ সজীব এবং কথাবাত্রায় মাত্রা ছিল। ওঁর উপযুক্ত পুত্ররাও সুপ্রতিষ্ঠিত এবং বুড়দা ব্যবস্থার সাথে জড়িত। একদল অনুসন্ধানী মানুষের পক্ষে বুড়দার আকর্ষণ তাই দুর্বার। ললিতবাবু গত বছর মারা গেলেন।

আজকাল পার্টিসিপেটরি কথাটা খুবই প্রচলিত। ঝোলে, ডালে, অম্বলে সবেতেই চলছে। লোকে খাচ্ছে। এর সাথে আছে কমিউনিটি-বেস্‌ড। দুটো কথাই ভেসে এসেছে উত্তরের অনুকূল হাওয়ায়। ইংরেজি দিয়ে। দুটোই ভাল কথা। আটের দশকের শেষের দিকে একজন অসাধারণ মানুষ রবার্ট চেম্বার্স, পার্টিসিপেটরি ম্যানেজমেন্ট কথাটি ব্যবহার করেন। করেও দেখান এবং তাঁর এই কথা ক্রমশ সুগৃহীত হয় উন্নয়নের আলোচনার পাতায় পাতায়। আমরাও তারপরে শিখলাম পার্টিসিপেটারি ম্যানেজমেন্ট। সরকারি, বেসরকারি সবরকম অলিন্দেই প্রতধ্বনিত হতে লাগলো টিসিপেটরি সিপেটরি পেটরি। আমরা আধুনিক হলাম। গবেষণায়, প্রয়োগে আর টাকা আদায় করার পদ্ধতি প্রশিক্ষণে। ওই কথা না লিখলে কোনো ফান্ডিং এজেন্সি আর টাকা দেবে না। আজ তাই আমরা সকলেই গলা তুলে জয়ধ্বনি দিচ্ছি পার্টিসিপেটরি এবং ইত্যাদিতে। ভাল কথা। অনুকূল জোয়ারেইত ভাসা ভাল।

'ষোলো আনা' কথাটা বা আরো ভালো ভাবে বললে বলা যায় 'ধারণা'টা 'পার্টিসিপেটরি' কথাটার থেকে একটু পুরোনো। যাঁরা 'পার্টিসিপেটারি' কথাটি চালু করেছেন, তাঁদের তখনও জন্মও হয়নি। তার আগেই আমাদের গ্রামে গ্রামে ষোল আনার ধারণা সুপ্রচলিত ছিল। দেখা যাক 'ষোলো আনা' কথাটার মানে কী? এই মানে খুঁজতেই আমরা বছর দেড়েক ধরে যাতায়াত করেছি বুড়দা গ্রামে। পুরুলিয়া জেলার বাগমুন্ডি থানার প্রায় একটা নাম না জানা গ্রাম হল 'বুড়দা'। এইখানেই আশি বছরের উপর চালু আছে ষোলো আনা সেচ ব্যবস্থা। কমবেশী দুশোটি পরিবার এই ব্যবস্থায় সামিল আছেন।

এই দুশোটি পরিবার সকলে মিলে একটি সেচের খাল এবং তার উপর নির্ভরশীল একটি সেচ ব্যবস্থা এবং তার উপর এতো বছর ধরে সাহায্য, অনুদান, প্রশিক্ষণ বিশেষজ্ঞের তত্ত্বাবধান ইত্যাদি কিছুই না নিয়ে বা পঞ্চায়েতের এই উন্নয়ন পরিকল্পনার অঙ্গ না হয়েও টিকিয়ে রেখেছেন, তাঁদের প্রত্যেকের জীবন, জীবিকা, আনন্দ, শিক্ষা, সবকিছুরই ভিত্তি হয় এই ষোলো আনা ব্যবস্থা। প্রত্যেকটি জমিতে প্রয়োজনমত জল পাওয়া, খাল মেরামত, জল অযথা নষ্ট না হতে দেওয়া, লুকিয়ে যাতে জল বের না করে নেওয়া হয় দেখা - এই সবই হল ষোলো আনা ব্যবস্থার ভিতরে। এখানেই শেষ নয়, এর মধ্যে বিচার ব্যবস্থা আছে, শাস্তি আছে। শাস্তি পেলে তা মেনে নেওয়ার রেওয়াজও আছে।

কোথা থেকে খরচের টাকা আসে? এর ব্যবস্থাও আছে। গ্রামের প্রত্যেকটি পরিবারকে বছরে দুবার যখন খাল সারাই এবং অন্যান্য কাজ হয় তখন প্রতিদিন একজনকে স্বেচ্ছা শ্রম দিতে হয়। না দিলে একদিনের মজুরি জমা দিতে হয়। প্রত্যেকে এই নিয়ম মেনে নেয়। এই মেনে নেওয়াটাই যেখানে অভ্যাস হয়ে যায় সেখানে আইন লাগে না। সারা ভারতে অনেক রাজ্য আছে যেখানে আইন করে পার্টিসিপেটারি সেচ ব্যবস্থা চালু করার চেষ্টা চলছে। তেমন কথাও শক্ত ভিতের উপর দাঁড়ায়নি। বুড়দায় আইন নেই। তাও দাঁড়িয়েছে। বুড়দা অনেক দশক এগিয়ে আছে।

আজকাল প্র্যাকটিসিং প্রজ্ঞা শিরোমণিরা পরম্পরাগত জ্ঞানের উপরে খুব চিন্তা করছেন। এটাই এখন চলছে। রাষ্ট্রসংঘও হাওয়া দিচ্ছে। পরম্পরাগত জ্ঞান নিয়ে পেটেন্টেড গড়াইৎরা প্রায়ই ইন্টারনেটে ঢোল জারি করে জানান দেন যে অমুক জায়গায় অমুক সেমিনার বা গুণীজনদের জমায়েত হবে। অতএব এই যে আমরা একটা পরম্পরাগত জ্ঞান নিয়ে লিখছি, এটাও কিন্তু একেবারে যুগোপযোগী এবং আগমার্কা অভিজ্ঞান।

অনেক চেষ্টা করেও আগের লাইনগুলোতে ঠেস না দিয়ে লিখতে পারলাম না। তার কারণ পরম্পরাগত জ্ঞান নিয়ে যতরকম তৎপরতা পরিদৃশ্যমান তার অনেকটাই কাগজে কলমে, পরবে পার্বণে। খুব কমই দেখা যায় যে দৈনন্দিন সিদ্ধান্তে তা সচরাচর ঢোকে বা ঢোকানোর চেষ্টা করা হয়।

কুমারী কমান্ডে ফেরৎ আসি। এক বছরের উপর হল আমরা কুমারী কমান্ড এলাকায় সেচ ও কৃষি ব্যবস্থা তথা কৃষকদের জীবন ও জীবিকার সামগ্রিক বিষয়বস্তু নিয়ে গবেষণা করেছি। আমাদের গবেষণার পদ্ধতি হল সরাসরি যাঁদের সমস্যা তাঁদের কাছে হাজির হওয়া। বুকে কান পেতে তাঁদের কথা শোনা, তাড়াহুড়ো না করে বুঝতে চেষ্টা করা কোথায় সমস্যা। পক্ষ, প্রতিপক্ষ, এদের বক্তব্য কি, পরিবেশ ও প্রাকৃতিক পরিষেবাগুলি কিভাবে বিপর্য্যস্ত হচ্ছে এবং তারপর উন্নততর পদ্ধতি খুঁজে বার করার চেষ্টা করা যাতে পরিবেশের ভারসাম্য বজায় থাকে। অযথা প্রাকৃতিক সম্পদ ক্ষতিগ্রস্থ না হয়। এই হল আমাদের মূল কথা, তা সে আমরা যেখানেই কাজ করি না কেন।

৩. কমান্ড এলাকায় পুকুর

আমাদের একটা কাজ ছিল এলাকার পুকুরগুলিকে মানচিত্রে চিহ্নিত করা। অধিকাংশ পুকুরই মৌজা ম্যাপে নেই বা সেচ দপ্তরের কাছে কোন হদিশ নেই। আমরা গ্রামবাসীদের সঙ্গে নিয়েই সবকটি জলাশয়ের ঠিকানা বার করেছি, তারা এই প্রথম কোন মানচিত্রে জায়গা পেল। এদের সংখ্যা ৩০০র বেশি। সংখ্যাটি আমাদের ভাবিয়ে তুল্‌লো। আমরা আরো নজর করে দেখলাম এই পুকুরের সংখ্যা কমান্ড এলাকার তলার দিকে বা ডিস্ট্রিবিউটারি খালের শেষের দিকেই বেশি। সেচ দপ্তরে এসব খবর ভাসাভাসা ভাবে ছিল বা এ খবরের কোন গুরুত্ব হয়নি। এই পুকুরগুলি মূলতঃ দুটো কাজে লাগে। প্রথমতঃ সেচের জলের জোগান আর দ্বিতীয়তঃ মাছ চাষ। প্রথম কাজটি বেশি যত্ন নিয়ে করা হয় আর দ্বিতীয়টি যাহোক তাহোক করে। কুমারী কমান্ড বলে নয়, অধিকাংশ সেচ প্রকল্পের তলার দিকে জল পৌঁছোয় না। এটাই সত্য কথা এবং এ নিয়ে তেমন কোন সোরগোল হয় না। তলার দিকের খাল তথা খালের জল যাদের পাবার কথা তারা ব্রাত্য। আমরা সম্পূর্ণ সমীক্ষা করে উঠতে পারলাম না কিন্তু কথায়-বার্তায় আমাদের একটা স্পষ্ট আন্দাজ যে উপরের দিকে তুলনামুলকভাবে উঁচু

জাতের মানুষের তথা কৃষক পরিবারের বসবাস আর খাল যতই নীচে নামছে ততই তার চার ধারে ক্রমশঃ দুর্বল এবং তুলনামুলকভাবে অনুন্নত জাতের ভিড়।

ভাবতে অবাক লাগে এমন সুন্দর একটি গবেষণার ক্ষেত্র বেমালুম চোখের আড়ালে থেকে গেল। যেখানে এটা পরিষ্কার যে খালের নিচের দিকে জল সময় মত দেওয়া যায়না সেখানে ওই পুকুরগুলির অসামান্য গুরুত্ব আছে সেচের তাগিদে। প্রয়োজন হল সরেজমিন সমীক্ষা করে এই পুকুরগুলি মাথায় রেখে একটি সামগ্রিক সেচ ব্যবস্থার চিত্রটি বের করে আনা যেখানে কোথাও যেন জল নষ্ট না হয়। আধুনিক সেচের আলোচনায় কমান্ড এলাকায় পুকুরের গুরুত্ব নিয়ে আলোচনাও হয়েছে। কিন্তু পুরুলিয়ার কমান্ড এলাকাগুলি সবই দুয়োরানি, তাই আধুনিক সেচ প্রযুক্তির আলো সেখানে পৌঁছোনোর হয়ত কথা নয় বা সময় হয়নি।

কথা নয় নাই থাকলো, কিন্তু বিকাশমনস্কতায় বাধা কোথায়, নাকি সর্বগ্রাসী আত্মকেন্দ্রিকতার খোঁয়াড়ে এসব চিন্তা আর জন্মাচ্ছে না? চোখের সামনে সাজানো একটা বিজ্ঞানসম্মত মডেল পড়ে রয়েছে, সাধারণ মানুষের বুদ্ধি-বিবেচনার একটা নজির গড়ে উঠতে চলেছে, অথচ কোন চেষ্টার খোঁজ পাওয়া যাবে না তার পদ্ধতি-প্রকরণকে আরও বিজ্ঞানসম্মত করার, আগমার্ক সেচব্যবস্থা বলে স্বীকৃতি দেওয়ার? ভাবতে অবাক লাগে কত সেমিনার আর কর্মশালায় কত মুন্ডহীন মুর্গীর সদ্ব্যবহার হয়, অথচ সেখানে কোন সাধারণ মানুষের মাথার দৌলতে কোন নতুন সেচ ব্যবস্থার চেষ্টা নিয়ে কোন আলোচনার জায়গা নেই। মাথার কোনও দাম নেই। মুর্গীরও নেই কৃষকেরও নেই।

আসলে সকলেই নিজেরটা গুছিয়ে নিচ্ছেন। আমি আপনি সকলেই। কৃষক, পঞ্চায়েত কর্মী, জনপ্রতিনিধি, রাজনীতিবিদ্ (পেশাদার বা অপেশাদার), সরকারি কর্মচারী, প্রযুক্তিবিদ্, প্রশাসক, ঠিকাদার, তস্য কর্মচারী সকলেই নিজেরটা গুছিয়ে নিচ্ছেন। আর সকলেই নিজেরটা গুছিয়ে নিচ্ছেন বলেই শেষ-মেষ সমাজটাই অগোছালো হ'য়ে পড়েছে। ভেঙ্গে যাচ্ছে। সমাজবোধ হারিয়ে যাচ্ছে। অদ্ভুত এক দুর্যোগের দিকে আমরা এগিয়ে চলেছি একা একা, সকলে। তারই মধ্যে কিছু শ্রদ্ধেয় মানুষ আছেন যাঁরা চেষ্টা করছেন এই অবস্থার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে কাজ করতে। তাঁরা বিরল।

৪. সমীক্ষার ফলাফল

আমরা কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ শেষ করেছি। সবচেয়ে প্রয়োজনীয় কথা হল যে সেচের জল ক্যানাল/ খাল দিয়ে কতদূর পৌঁছবে তার মানচিত্র করে ফেলেছি। এই প্রথম এই এলাকার পুকুর তথা জলাশয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ মানচিত্র তৈরি হল। সেচ দপ্তরও জানতেন না এই এলাকায় এত পুকুর আছে এবং যার অধিকাংশই সেচের কাজে ব্যবহার হয়। সেচের জলেই ভরাট হয়। আগাগোড়া এই কাজে এলাকার লোকেরা সঙ্গে থেকেছেন এবং আমরা মৌজা

ম্যাপে দাগ নম্বর ধরে ধরে কাজ শেষ করেছি। এই মানচিত্রের বৈশিষ্ট্য হল এর নির্ভরযোগ্যতা। এতদিন ধরে গ্রামে গ্রামে ঘুরে মনে হয়েছে বিভিন্ন বিষয়ে নির্ভরযোগ্য তথ্যের যথেষ্ট অভাব রয়েছে। তার থেকেও বড় কথা হল এই অভাব থাকার ফলে ভুল বোঝাবুঝি এমনকি অসন্তোষ পর্য্যন্ত জায়গায় দানা বেঁধে আছে। খোলামেলা আলোচনার পক্ষে এটা একটা বড়ো বাধা।

আমরা চাই নির্ভরযোগ্য তথ্যের ভিত্তিতে কথা বলা বা আলোচনা করাকে এই এলাকার একটি অভ্যাসে পরিণত করতে। যে কটা কারণে আমাদের দেশে গরিব মানুষের সংখ্যা বেড়েই চলেছে তার মধ্যে নির্ভরযোগ্য তথ্যের অভাব বা তাকে উদ্দেশ্যমূলকভাবে ঢাকা চাপা রেখে দেওয়া একটি প্রধান কারণ, আমরা চাইছি সমস্ত বিষয়ে নির্ভরযোগ্য তথ্যের পাটাতনের উপরে নিশ্চিন্তে বেঁচে থাকতে, আলোচনা করে সমস্যার সমাধান করতে।

আমরা গ্রামের মানুষের সাহায্য নিয়ে আরো একটি কাজ করেছি। ৩২টি মৌজা জুড়ে গ্রামের মানুষ কে কেমন আছেন, চাষবাস কেমন চলছে - ইত্যাদি একটি প্রাথমিক সমীক্ষা বের করেছি। বিস্তারিত রিপোর্ট দপ্তরে জমা পড়েছে। এখানে কেবল আমরা কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়েই আলোচনা করব।

সবচেয়ে দেখার ব্যাপার হল যে খালের উপরদিকের বাসিন্দারা সমস্ত দিক দিয়েই সুবিধাজনক অবস্থায় আছেন এবং সবরকম ভাবেই বারবার সেটা ফুটে উঠেছে আমাদের সমীক্ষা নীচের বাসিন্দারা জল কম পান, কাজও কম পান। উপরতলার শতকরা ৮৬ ভাগ খালের জল পান আর নিচুতলার শতকরা ১৩ ভাগ খালের জল পান। আজ অবধি কেউ এই প্রাথমিক হিসাবটাও করে দেখেননি। নীচের তলার বাসিন্দারা তুলনামুলকভাবে কম আয় করেন। কথা বলে মনে হয়েছে এঁদের গলার আওয়াজও কম। এঁরা এই তারতম্যকে ভবিতব্য বলেই মেনে নিয়েছেন।

হিসেবের খুঁটিনাটিতে আমরা এখানে যাচ্ছিনা কিন্তু বৈষম্যের চিত্রটা আমাদের কাছে পরিষ্কার এবং একই সাথে পরিষ্কার হয়েছে আমাদের এগিয়ে যাওয়ার পথের নিশানা। সমীক্ষা আমাদের আরো করতে হবে। আমরা আরো খুঁটিয়ে জানার চেষ্টা করব। সমীক্ষাই হল নির্ভরযোগ্য তথ্য সৃষ্টির সিঁড়ি।

মাঠের কাজের ফাঁকে ফাঁকে আমরা ভারতের অন্যান্য রাজ্যে 'যৌথ সেচ ব্যবস্থা' - কেমনটির কী প্রগতি হয়েছে তা দেখাবার চেষ্টার করছি। ভারতবর্ষের আরও দশটি রাজ্যে যৌথ সেচ ব্যবস্থার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এই দশটি রাজ্যে যৌথ সেচ ব্যবস্থার আইনও চালু হয়েচে। এই রাজ্যগুলি হল অন্ধ্রপ্রদেশ, গোয়া, কর্ণাটক, মধ্যপ্রদেশ, উড়িষ্যা, রাজস্থান, তামিলনাড়ু,

কেরালা, বিহার ও মহারাষ্ট্র। এদের অভিজ্ঞতার কথা অনেক লেখা হয়েছে। আমরা যা যা পেয়েছি পড়েছি। সব মিলিয়ে আমাদের চারটে কথা বলার আছে।

- ☐ এই নতুন ব্যবস্থা কৃষকদের বোঝানোর জন্য কোনও জায়গাতেই তেমন ধৈর্য্যের প্রমাণ মেলেনি। এরই ফলে আইন প্রণয়ন হয়েছে ঠিকই, কিন্তু আশানুরূপ ফল প্রায় কোথাও পাওয়া যায়নি। অনেক ক্ষেত্রেই এই আইনের জোরে কায়েমি স্বার্থের একটি বিকল্প নেতৃত্ব তৈরি হয়েছে

- ☐ কোনও জায়গাতেই খাল থেকে যাঁরা দূরে থাকেন তাঁদের সম্বন্ধে কোনও স্পষ্ট চিন্তাভাবনা নেই।

- ☐ জলের সদ্ব্যাবহার নিয়ে তেমন কোনও প্রশিক্ষণ, কী করে কম জলে চাষ করতে হয় তার আলোচনা, এ ধরণের কোনও ভাবনাচিন্তা দানা বাঁধেনি সব জায়গায়।

- ☐ কোনও রাজ্যেই পরিবেশ দূষণের তথা প্রাকৃতিক ভারসাম্যের কোনও আলোচনা নেই। অথচ এই সমস্ত সেচ সেবিত এলাকায় ব্যাপক হারে রাসায়ণিক সার এবং কীটনাশকের ব্যবহার নিশ্চয় হচ্ছে।

আমরা চেষ্টা করব এই ভুলগুলি আর যাতে না হয় বা অন্তত কম করা যায়।

৫. চার দফা কর্মসূচী

আমরা এখন অবধি যা কাজ করেছি তার ভিত্তিতে এবার কি করব বলে ভাবছি তার একটা খসড়া সকলের সামনে রাখলাম। আমরা এর উপরেই আলোচনা করে পাকাপাকিভাবে একটি ইস্তেহার বানানোর কাজে হাত দেব এমন ইচ্ছে আছে।

প্রথমতঃ আমরা উদ্বিগ্ন জল সংক্রান্ত অনিশ্চয়তা নিয়ে। এই অনিশ্চয়তা কমিয়ে আনতেই হবে। সে ক্ষেত্রে সেচ দপ্তর জমা জলের হিসেবের ভিত্তিতে কতখানি জল বছরে কবার কদিন ধরে কি হিসেবে ছাড়বেন সেটা সুনিশ্চিত করবেন। একইভাবে যাঁরা জল ব্যবহার করবেন তথা সকল গ্রামবাসী দায়বদ্ধ থাকবেন, যেন

ক) কোনো জায়গায় কোথাও কেউ খাল কেটে জল নিজের জমিতে না নিয়ে নেন।
খ) যদি সেচের জলে পুকুর ভরা হয় তবে সেই অনুপাতে ক্ষেতে সেচের জল কম যাবে।

গ) একই সঙ্গে সব ক্ষেতে জল পাওয়া যাবে না। জল ভাগ ভাগ করে সময়ক্রম আনুযায়ী পৌছবে।

ঘ) জলের দাম দিতে হবে।

সেচ দপ্তরের দায়িত্ব হবে সমস্ত সেচ প্রকল্পের খালগুলি যেন শেষ পর্যন্ত জল নিয়ে যেতে পারে সেই অবস্থায় রাখা। এই ক্ষেত্রেও গ্রামবাসীদের দায়িত্ব থাকবে খাল তদারকি করা এবং মূলত শ্রমের বিনিময়ে যে রক্ষণাবেক্ষনের কাজ করা যায় তা NREGA র আওতায় এনে ফেলা। এ সমস্ত সিদ্ধান্ত কোনোমতেই গ্রাম সংসদ পর্যায়ে আলোচনা না করে হবে না।

দ্বিতীয়তঃ কমান্ড এলাকার দরিদ্রতম পরিবারগুলির জীবনযাপনে আমরা যে বৈষম্যের হিসেব পেয়েছি, যা অনেক ক্ষেত্রে যথেষ্ট উদ্বেগজনক, তা কমিয়ে আনতে হবে। ভাবতে অবাক লাগে তপশিলী উপজাতিদের মধ্যে প্রতি ১০০০ পুরুষে মাত্র ৭০০ মহিলা আছেন। এ ব্যাপারে অবিলম্বে আলোচনা ও কর্মসুচী প্রয়োজন। দরিদ্রতম পরিবারের প্রাথমিক সমীক্ষা হয়েছে। ন্যুনতম প্রয়োজনগুলি চিহ্নিত করে জরুরি ভিত্তিতে কাজে হাত দেওয়াতে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কাছে হাজির হতে হবে। আগেই বলেছি আমরা বাদ পড়া মানুষদের কথা প্রথমেই ভাবতে চাই। ভাবাতেও চাই।

তৃতীয়তঃ আমরা বিচলিত যে পুরুলিয়ার সেচ ব্যবস্থার কোন আলোচনাতেই একটি প্রশ্ন কখনই ওঠেনি, বুড়দা ষোলো আনা ব্যবস্থাতেও নয়। প্রশ্নটি হল পরিবেশ ও প্রাকৃতিক ভারসাম্যের। আমরা এইটেই জোরের সঙ্গে তুলে ধরতে চাই। দেশের যাবতীয় সেচ সেবিত এলাকায় 'আধুনিক' কৃষি চালু হয়েছে। অকুতোভয় চাষীরা কয়েক দশক ধরে মূলত ডিলারদের চালাকিতে রাসায়ণিক সার আর কীটনাশক দিয়ে গেছেন। আজ গেল গেল রব উঠেছে। বিজ্ঞানীরা আশঙ্কা করছেন যে সবচেয়ে বেশি দূষণের চাপ এই আধুনিক চাষের জমি থেকেই উঠে আসছে। তাই আমরা চাই **সেচ সেবিত এলাকায় পরিবেশ ভারসাম্যের আলোচনা আজ বাধ্যতামূলক হোক**। অর্থাৎ সেচসেবিত এলাকায় খেয়াল রাখতে হবে যেন চাষের পদ্ধতি পরিবেশ ভারসাম্য নষ্ট না করে। একই ভাবে এটাও মনে রাখতে হবে যে চাষীকে কেবল "রাসায়ণিক সার বা কীটনাশক দিওনা' এ কথা বলে কোন ও লাভ হবে না। তাঁকে যত্ন করে বিশেষজ্ঞের তত্ত্বাবধানে যথাযথ কৃষি ব্যবস্থা হাতে ধরে শিখিয়ে দিতে হবে। তাঁদের আয় যেন কমে না যায়। আমরা যথাযথ কৃষির পদ্ধতি চালু করার কথা আলোচনা করতে চাই, গোড়াপত্তন করতে চাই।

চতুর্থতঃ আমরা চিন্তিত যে কমান্ড এলাকায় জল সকলে মিলে যে ভাগ করে নেবেন এমন কোন প্রশাসনিক যন্ত্রের অস্তিত্ব এখনও কার্যকারী ভাবে নেই। আমরা নতুন কোনও

পারিকাঠামো যেমন জল কমিটি / সমিতি জাতীয় কোন ও আকৃতি খাড়া করার এই মুহূর্তে পক্ষপাতী নই। সর্বসম্মত বিভাজন (যেমন বুড়দা ষোলো আনায় হয়) সংসদের মিটিং এ আলোচনা করার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। যাতে আলোচনা গড়াপেটা না হয় বা কোন ও চাপের মধ্যে থেকে না হয় তা সুনিশ্চিত করতে হবে। এছাড়া জল বিভাজনের আকৃতিটি কয়েকটি গ্রাম উন্নয়ন কমিটিকে নিয়ে জড়ো করে করা যেতে পারে। সবার উপরে সেচ দপ্তরের এবং কমান্ড এলাকার প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি যৌথ কমিটি থাকবে পরিচালনার দায়িত্বে। এই প্রশাসনিক ব্যবস্থার আংশিক শিক্ষা বুড়দা ষোলো আনার অভিজ্ঞতা ধরে এগোতে পারে। বুড়দা ষোলো আনার কথা বার বার উঠে আসছে এ জন্যই যে সেখানে কোনও নির্দিষ্ট নেতা নেই। প্রকৃতই যৌথ নেতৃত্বের দৃষ্টান্ত তারা স্থাপন করেছেন যা সারা ভারতবর্ষে অত্যন্ত বিরল।

প্রত্যেক স্তরে আমরা সিদ্ধান্ত নেবার পদ্ধতি তথা সিদ্ধান্তগুলির গুণগত মানের উপর নজর রাখতে চাইব, এই সিদ্ধান্তগুলিতে মহিলাদের যেন জোরালো বক্তব্য থাকে। একবার ভাল অভ্যাস দাঁড়িয়ে গেলে আর তখন অতো নজরদারির প্রয়োজন হবে না। **অভ্যাস আইনের থেকে অনেক বেশি শক্তিশালী সংস্কারক**।

শেষ করার আগে আমাদের গবেষণা পদ্ধতি সম্বন্ধে আপনাদের দু-একটা কথা বলা দরকার বলে মনে করি। দুটি আপাত বিচ্ছিন্ন ঘটনার মধ্যে যোগসূত্র বার করতে পারাই হল বিজ্ঞান। ভারতবর্ষের প্রায় যে কোনও সেচ ব্যবস্থায় এরকম অনেক বিচ্ছিন্ন ঘটনা আছে যার যোগসূত্র বার করা হয়নি। আর এই না হওয়ার ফলে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন অন্তে থাকা মানুষগুলি। আমরা একথাটাও ঠিক বলে মনে করি যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ যোগসূত্রগুলি পরিষ্কার হয়ে আসবে।

প্রথমবারের ফলাফল নির্ভরযোগ্য নাও হতে পারে। আমরা তাই ফলাফলগুলি নিয়ে আবার ফিরে যাচ্ছি এলাকার মানুষের কাছে। আমাদের বিজ্ঞান ঠিক হয়েছে কিনা, বিচ্ছিন্ন ঘটনার যোগসূত্রগুলি আমরা ঠিক মতো ধরতে পেরেছি কি না, আমরা তা যাচাই করতে ফিরে যাচ্ছি তাঁদের কাছে যাঁদের কাছে বসে ওই গুরুত্বপূর্ণ বিচ্ছিন্ন ঘটনাগুলির হদিশ পেয়েছি, এমনকি কয়েকটি ক্ষেত্রে হয়তো তাঁদের কাছে যোগসূত্রের ইঙ্গিতও পেয়েছি। তাই আমাদের গবেষণা শেষ হবে তখনই যখন আমরা স্পষ্ট করে বলতে পারব। যাচাই করে বলতে পারব কেমন করে এগোতে হবে বিকাশের নাগাল পেতে। আরো একটি বলার কথা থেকে যায়। বিকাশের অধিকাংশ কর্মকান্ডে এখনও যে পদ্ধতিতে কাজ হয় তা হল বিশেষজ্ঞরা পরিকল্পনা ভাবে নিয়ে করেন আর উপভোক্তরা তা গ্রহণ করবেন। ক্ষমতার বিকেন্দ্রিকরণের পরও এই পদ্ধতির কোনও মৌলিক বা কার্যকরী পরিবর্তন সর্বস্তরে বা সর্বক্ষেত্রে হয়নি।

আমরা একটু অন্যভাবে ভাবি। আমরা মনে করি যে বিকাশ সর্বদাই যাদের উদ্দেশ্যে বিকাশ তাঁদেরই ভিতরকার ব্যাপার। আমরা তাঁদের বিকশিত হবার ইচ্ছাতে উস্কানি দিতে পারি। সম্ভাব্য বিকাশের পথ নিয়ে আলোচনা করতে পারি। কিন্তু প্রকৃত সিদ্ধান্ত (গড়াপেটা সিদ্ধান্ত নয়) যতক্ষণ তাঁরা না নিচ্ছেন বিকাশের কেবল টাকাই খরচ হয়ে যাবে আর যাদের জন্য বিকাশের টাকা, তার প্রত্যেকটি ১ টাকায় ৮৬ পয়সা মাঝপথে খোয়া যাবে। আর কত দিন আমরা এটা মেনে নেব?

এলাকার মানুষকে এক ধরনের ঠিক-ভুল, ভাল-মন্দ, উচিত-অনুচিতের আকৃতিতে পৌঁছতে আমরা সাহায্য করব। এই দ্বিতীয় আকৃতিতে মানুষ বৈষম্যকে কেবলমাত্র উদাসীনতা দিয়ে মানিয়ে নেবেন না বা ভাগ্য বলে মেনে না নিয়ে অনুসন্ধানে নামবেন। জানতে চাইবেন। নিজের অধিকার বুঝে নেবেন। বিকাশ বা উন্নতি চালাকি দিয়ে হয়না, কঠোর পরিশ্রম দিয়েই হয়। একথাও জানা আছে আমাদের। বিকাশের প্রথম ধাপ এইখানেই এবং বিকাশ নিয়ে আমরা গবেষণা করি, আমাদের দায়বদ্ধতাও তাই এইখানেই।

৬. সাতটি সম্ভাবনা এবং তারপর কি হল

প্রথমেই বলেছি, পুরুলিয়ার ছোট এবং মাঝারি সেচবাঁধ প্রকল্পগুলিতে যৌথ সেচ ব্যবস্থার (পার্টিসিপেটারি সেচ ব্যবস্থা) প্রচলন বা গবেষণা আমরাই প্রথম শুরু করেছিলাম। ২০০৭ সালে। এই গোটা পুরুলিয়া জেলায় সেচ সেবিত এলাকা ক্রমশ কমে যাচ্ছে। এই অবস্থায় যৌথ সেচ ব্যবস্থা প্রধানত যে কয়েকটিভাবে সেচ ব্যবস্থাকে সমৃদ্ধশালী করে তুলতে পারত তা হলঃ

১) জলের অপচয় বন্ধ করে সেচ সেবিত এলাকা বাড়ানো।
২) জল ছাড়া এবং বিতরণের সময়সূচি বর্ষা, প্লাবন এবং কৃষকের প্রয়োজনীয়তাকে মাথায় রেখে ঠিক করা এবং সবাইকে জানানো। এর ফলে জলের সদ্ব্যবহার হবে এবং বাড়তি কৃষিজমি সেচের আওতায় আসবে।
৩) প্রযুক্তিবিদ্ এবং সেচ সেবিত এলাকায় কৃষকদের এবং পঞ্চায়েতের মধ্যে গঠনমূলক সম্পর্ক স্থাপন করা এবং সেচের খাল রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব ভাগাভাগি করে নেওয়া।
৪) আধুনিক কৃষি বিজ্ঞানের সাহায্যে কৃষকদের আয় বাড়ানো।
৫) খালের নিচের দিকের কৃষকদের প্রতি অবহেলা এবং প্রতারণার অবসান ঘটানো।
৬) পুকুরগুলিকে সেচের কাজে লাগানো ছাড়াও সেগুলিতে উন্নত মাছ চাষ চালু করা।
৭) জলের দাম আদায় করা এবং আদায় করা অংশ খাল সারানো এবং খুঁটিনাটি রক্ষণাবেক্ষণে খরচ করা।

সাতটি সম্ভাবনার কথা আমরা বলেছি এবং এর সাতটাই সম্ভব। আমরা ২০০৭ সালে শুরু করে মাঝপথে আটকে পড়েছি। কাজ কিছু দূর পর্য্যন্ত করে অসমাপ্ত রেখেই আমাদের সরে আসতে হল। রাজনৈতিক এবং প্রশাসনিক সদিচ্ছার যে জোরটা পেলে এগোন যেত সেখানে টান পড়ে গেল, আমরা বিস্মিত হইনি।

আমরা যে পাঠশালায় সেচব্যবস্থার প্রযুক্তি নিয়ে পড়াশুনো করেছিলাম, যেভাবে পড়েছিলাম তার বুনিয়াদ আজও একই আছে। আমরা কোথাও পড়িনি যে, যার জন্য সেচব্যবস্থা তাকে সঙ্গে নিয়ে চলাটা একটি মৌলিক পাঠক্রমেরই অঙ্গ, এটি একটি বাধ্যতা। অথচ এই যে মানুষের সাথে, কৃষকদের সাথে কাজ করাটাও যে একটা বৈজ্ঞানিক ব্যাপার, একটি কঠিন বোঝাপড়ার ব্যাপার, একটি অপরিচিত সংস্কৃতির সঙ্গে মেলবন্ধনের ব্যাপার, এই দায়বদ্ধতা কোন সেচব্যবস্থা শিক্ষার পাঠক্রমে নেই। আজ পর্য্যন্ত এই পাঠক্রম সুস্থ এবং সমাজমুখী করার কোনও চেষ্টা হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই।

সেচব্যবস্থার প্রয়োজন পড়ে কৃষিকে সমৃদ্ধ করতে। এর ইতিহাস অনেক পুরানো এবং অসাধারণ। আমরা এখন তা নিয়ে আলোচনায় যাব না। কৃষকরা নিজেরাই তাদের জমিতে সেচ দেওয়ার চমৎকার পারদর্শিতার নজির সারা ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে সৃষ্টি করে রেখেছেন। তাদের এই জ্ঞানে সেচব্যবস্থা যারপরণাই সমৃদ্ধ। এই ঐতিহাসিক পটভূমিকার কোনও স্থানই নেই আমাদের সেচ প্রযুক্তির পাঠক্রমে। যেন সেচ প্রযুক্তিবিদ্‌রা সব ভূঁই ফোঁড় কারণ এমনটি হলেই শুধু তাঁদেরই নয়, তাঁদেরকে নিয়ে যাঁরা বিশাল উন্নয়নের ধাপ্পাটা চালু করেছেন সেই মহা পরাক্রমী ধান্দাবাজদেরও সুবিধে। সর্বদাই সঙ্গত করেছেন সুযোগসন্ধানি সাদা চামড়ার বিশেষজ্ঞরা, লর্ড ম্যাকাউলের প্রবর্তিত মগজ-ধোলাইয়ের কবলে পড়ে আমরা সবাই শিখেছি আমরা কম জানি, ওরা বেশি জানে। সম্পূর্ণ একটা ভুল ভিতের উপর কি চমৎকার ইমারত এঁরা গড়ে তুলেছেন। পরিকল্পনা কমিশন, এ কমিশন, সে কমিশন। সবাই নিশ্চিত যে সেচ ব্যবস্থার ইতিহাস শুরু হয়েছে প্রযুক্তিবিদের বানানো বাঁধের আমদানির পর থেকেই।

এ এক অদ্ভুত ব্যাপার। আমাদের কথা এই নয় যে কৃষকরা যা বোঝেন তাই সঠিক এবং সেটাই বাদ পড়া খুব খারাপ কাজ হয়ে গেল। আমাদের বক্তব্য এই যে প্রত্যেকটি সেচসেবিত এলাকার কৃষকরা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় থাকেন, যেমন থাকেন ওই সেচ ব্যবস্থার জন্য বাঁধের পরিকল্পনা করেছেন যে প্রযুক্তিবিদ্‌রা। এটা হলপ্‌ করে বলা যায় যে এই কৃষকদের যা উপলব্ধি, তাঁদের নিজস্ব ভাল-মন্দ সম্বন্ধে যা ধারণা তাকে হিসেবের মধ্যে না নিলে কোনও সেচ ব্যবস্থা সফলও হবে না, সম্পন্নও হবে না। এটাও ঠিক যে কৃষকদের ভাবনা চিন্তায় কোন এমন একটা চেহারা নেই যা একবার জেনে ফেললেই সব জায়গাই জানা হয়ে গেল। অসাধারণ বৈচিত্র্য আছে তাঁদের চিন্তায়। যেহেতু তাঁদের জীবনের অনেকটাই এই সেচের উপর নির্ভর করে তাই তাঁরা ভাবেন এবং তাঁদের এলাকাগত বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতেই

ভাবেন। প্রত্যেকটি সেচ প্রকল্পে যাঁরা সেচসেবিত তাঁদের সাথে সমান্তরাল আলোচনা করে তবেই করা যাবে একটি সেচ ব্যবস্থার সঠিক পরিকল্পনা এবং তাঁর প্রয়োগ। আজ অবধি এমন পাঠক্রম চালু হয়নি। সদিচ্ছার জোরে কোন কোন মহৎ প্রযুক্তিবিদ্ এ ধরনের প্রকল্পে রূপদান করেছেন। কিন্তু এঁরা ব্যতিক্রম।

আসলে উন্নয়নের শেষ কথা যে মানুষ এটা ভাল করে, অন্তর দিয়ে, সদিচ্ছা দিয়ে বোঝার কোন পাঠশালা গড়ে উঠলো না। গড়ে উঠলো বাদ পড়া মানুষগুলোর দোহাই দিয়ে দেশের সম্পদের তছ্রূপ আর লুণ্ঠনের বুনিয়াদ। বাদ পড়ে যাওয়া মানুষগুলির সুষুপ্তি-ই উন্নয়নের কারবারিদের বেঁচে থাকার নিশ্চিন্ততা।

যে সেচ সচিবের উদ্যোগে এই কাজটি শুরু হয়েছিল, তিনি এখন অবসরপ্রাপ্ত। এই লেখাটির প্রত্যেকটি শব্দের সঙ্গে তিনি সহমত পোষণ করেন। তবে ওই পর্য্যন্তই দৌড়, এরপর আর বাঁকা লাঠি সোজা করার ক্ষমতা তাঁর নেই। একথা তিনিও জানেন।

পরিশেষে একটি প্রশ্নের উত্তর দিতে অসুবিধা হয়। পুরুলিয়ার একজন বর্ষিয়ান কৃষক নেতা জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে আমি আর যাই না কেন? এটা ঠিক যে আগে আমার ফোন পঞ্চায়াতের বা এলাকার নেতারা ধরতেন না। শেষের দিকে ওঁরা সাদা কাগজে সই করে বলতেন যা লেখবার লিখে নিন। আমরা চাই কাজটা হোক। কাজ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় পঞ্চায়েত থেকে জেলা স্তরেও প্রশ্ন রাখা হয়েছিল। উত্তর আসেনি। তবুও তাঁদের সবাইকে নিয়ে সেচের জল কতদূর গড়ায়, তার যে ম্যাপ, তা আমরা শেষ করেছি (চুয়াল্লিস্‌টা মৌজা ম্যাপ ধরে প্রত্যেকটি মাঠে ঘুরে ঘুরে)। সেই ম্যাপটি আমরা দিয়ে যেতে পারব তাঁদের ব্যবহারের জন্য। ওঁরা মনে করেন যে ওটা তাঁদেরই ম্যাপ। কিন্তু ওঁরা কখনই মনে করতে পারেন না যে সেচ বাঁধটাও তাঁদেরই প্রকল্প। এই প্রকল্পের রক্ষণাবেক্ষণ, যত্ন এ কাজও তাঁদেরই কাজ। সব দোষ তাঁদের নয়।

উন্নয়ন বা বিকাশের গবেষণাচর্চার ক্ষেত্রে আমরা মনে করছি যে যখন পিছিয়ে পড়া মানুষের বিকাশের কথা বলা হয় তখন একমাত্র তাঁদের ইচ্ছে, উৎসাহ এবং সক্রিয় অংশগ্রহণ ছাড়া অন্য যে কোন চিন্তাই অর্থহীন। তাই আমাদের গবেষণা শেষ হবে যখন আমরা দেখতে পাব যে যাদের জন্য উন্নয়নের কথা বলছি, বিশেষ্ট যাঁরা উপেক্ষিত বাদ পড়ে যাওয়া মানুষের দল, তাঁরাও বিকাশের কথা, উন্নয়নের কথা ভাবতে শুরু করেছেন।

৭. যা হলে ভাল হত

কুমারী ড্যাম থেকে তিনটি গ্রাম পঞ্চায়েতের কৃষকরা সেচের জল পেয়ে থাকেন। এর ফলে এলাকার মানুষ উপকার পেয়েছেন। চাষবাসে উন্নতি হয়েছে। তবু এটা ঠিক যে জল নষ্ট হয়েছে অনেক বা জল যতদূর যে সময় যতটুকু পৌঁছতে পারত তা পৌঁছোয় নি।

জল কমে আসছে। আরো কমবে। এটাই বিপদ। তাই দরকার জল বুঝেসুঝে ব্যবহার করা। জল কেবল চাষ নয় সমগ্র গ্রাম জীবনের ভালমন্দের মূল। আমরা এই জলের ব্যবহার বা জলের জোগান আরো অনেকটাই পরিবেশের তথা প্রাকৃতিক ভারসাম্যের কথা ভেবে এবং আরো সমাজ সচেতনভাবে করতে চাই, যাতে প্রত্যেক কৃষকের তথা প্রত্যেক গ্রামবাসীর জীবন এবং জীবিকার উন্নতি হয়। আমরা বিশ্বাস করি সকলে মিলে যৌথভাবে পরিকল্পনা করে কাজে হাত দিলে, কাজ করে যেতে পারলে, অবস্থার উন্নতি হবেই।

৩০-৪০ বছর আগে যে পরিকল্পনা করা হয়েছিল আমরা ঠিক সেইভাবে নাও করতে পারি। সবটাই সেইভাবে করলে যদি হতই তবে আমাদের মাথা খাটাবার দরকার পড়ত না। এ ধরণের সমস্যার সমাধানে অপর একটি পথ হল সমস্যাকে সমগ্রের অংশ হিসেবে দেখা। সহজ করে বললে সেচ ব্যবস্থার কথা যখন ভাবব তখন ড্যামে যে জল আসছে তার কথাও ভাবব। সেই জলে পলি বয়ে আসে তাতে ড্যামে পলি জমে। যদি বয়ে আসা জলের পলি ড্যামে পৌঁছনোর আগেই অনেকগুলি পুকুর ধরে রাখতে পারি তাহলে ড্যামে অনেক পলি কম জমবে। সমগ্রের অংশ হিসেবে দেখতে হলে এই পুকুর কাটার কাজটাও গুরুত্ব পাবে। তেমনি জল ব্যবহার ভালভাবে করলে, খেয়ালখুশি মতো খাল থেকে নালা কেটে নিজের স্বার্থে দশজনের জল নষ্ট না করলে, উৎপাদন অনেক বেশি হবে। আরো কৃষককে সেচের আওতায় আনা যাবে। এক কথায় বড় ছবিটা দেখতে পাওয়া। এ কথা আগে বলেছি।

আমরা এলাকার কৃষকদের সাথে কথা বলেছি। বয়স্করা বলেছেন ছেলেরা আজকাল আর কিছু প্রশ্ন করে না। জোয়ান কৃষক ছেলেরা বাবাকে জিজ্ঞাসা করে না সে কী চাষ করবে। কত সার দেবে। সে যে তার বাবাকেই বাদ দিল তা নয়, বাদ দিল বাপ-ঠাকুরদার অনেক বছরের জমানো অভিজ্ঞতাকেও। চাষের জমিতে এটাই আজ মস্ত বড় বিপদ। আমরা যখন সমগ্রের অংশ হিসেবে দেখার কথা বলছি, আমাদের একটা বড় দায়িত্ব হবে বয়স্ক কৃষকদের সাথে বসা, তাঁদের কথা মন দিয়ে শোনা, তাঁদের বুনিয়াদি জ্ঞানের সাহায্য নেওয়া। একটা কথা মনে রাখা দরকার যে আধুনিক চাষ বুনিয়াদি চাষের বিকল্প নয়। আধুনিক চাষ তখনই ধোপে টিকবে যখন তা বুনিয়াদি চাষের ভিতের উপর দাঁড়াবে। কৃষকরা তথা গ্রামবাসীরা যখন কোনও সিদ্ধান্ত নেন, কেন তা নেন, কিভাবে নেন, এ সমস্ত যত্ন করে জানার প্রয়োজন এবং সেই ভিত্তিতেই নতুন সিদ্ধান্ত নেওয়া। এই সবই হল সমগ্রের অংশ হিসেবে দেখার গঠনক্রম। নতুনভাবে কাজ করার মূল কথা হল সকলে মিলে কাজ করা, কেবল নিজের বা গোষ্ঠীর স্বার্থে

কাজ না করা। এই কাজ করাকেই বলে যৌথ ব্যবস্থা বা যৌথ পরিচালন ব্যবস্থা। আমরা দেখেছি এর খুব ভাল দৃষ্টান্ত আছে বুড়দা ষোল আনায়। গ্রামের মানুষ সবাই মিলে বাঁধ রক্ষণাবেক্ষণ এবং জল ভাগাভাগির কাজ বহুকাল ধরে করে আসছেন। আমরা তাঁদের কাছ থেকেও শিখব।

আমরা এই কাজে সমস্যাকে সমগ্রের অংশ হিসেবে দেখার পথ অনুসরণ করে শেষ পর্য্যন্ত একটি যৌথ কর্ম পদ্ধতি এবং ষোল আনা পরিচালন ব্যবস্থা খুঁজে বার করার ইচ্ছে ছিল। হলনা। আমরা খুঁজে দেখেছি আমাদের কোথায় দুর্বলতা ছিল। এই দেশে প্রকৃত অভাবী মানুষের জন্য কিছু করা সহজ নয়। কিন্তু অনেক সহজ হল সেটা হতে না দেওয়া।

এই সামান্য দু-এক পাতাতে সব কিছু বিছিয়ে লেখা সম্ভব নয়। তার মানে এও নয় যে যা বলা হয়েছে তা পড়ে যৌথ সেচ ব্যবস্থা সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা করতে অসুবিধা হবে। কিন্তু এই দু পাতা লেখার পিছনে একটি অতি বিনীত আবেদন আছে। আর একটু সাহস দিলে বলি, যে পশ্চিম বাংলার ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা, নানান কর্মে নিযুক্ত স্ত্রী-পুরুষ কারবারি, জনগণ, প্রশাসন, রাজনীতিবিদ্ - এঁদের সকলের কাছেই আমাদের আবেদন যে উন্নয়নের প্রচলিত পথ অন্ধের মত অনুসরণ নাও করতে পারেন। উন্নয়ন সংক্রান্ত বহু নির্দেশ বান্ডিল বেঁধে পড়ে থাকে সরকারি অফিসের আনাচে কানাচে। পরে কাগজ হিসেবে বিক্রি হয়ে যায়। তবুও একদল লিখে চলেছেন এক দল ছেপে চলেছেন। তৎপরতার সঙ্গে দপ্তরে দপ্তরে হাটে বাজারে তা পৌঁছেও যাচ্ছে। আমাদেরও কথা হল **যা ঠিক বলে মনে না হবে তা বাতিল করতে শিখুন, যা ভালো তাকে গ্রহণ করার সাহস দেখান**। বুড়দার মত হয়ত আরো কত না মহৎ দৃষ্টান্ত আপনাদের আশেপাশেই আছে যা যত্ন করে অনুসন্ধান করলে, রপ্ত করলে পশ্চিম বাংলার মানুষ ভবিষ্যতে অনেক বেশি আনন্দে থাকতে পারবেন।

কৃতজ্ঞতা

এই ধরণের কাজে অনেক মহানুভব মানুষ এগিয়ে আসেন সাহায্য করতে। আমরাও তা পেয়েছি। এলাকার গ্রামবাসীদের মধ্যে যাদের কথা না বললে এই পুরো লেখাটা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে তাঁরা হলেন কৃষক নেতা শ্রী খগেন মাহাতো আর আমিনবাবু শ্রী গঙ্গাধর মাহাতো। পুরুলিয়ার মানুষদের মধ্যে অসামান্য সাহায্য পেয়েছি শ্রী সৌম্যনাথ মল্লিকের কাছে। একই সাথে বলতে হয় বামফ্রন্ট কমিটি চেয়ারম্যান অতি বৃদ্ধ শ্রী নকুল মাহাতোর কথা। আমাদের গবেষণার দলে শ্রী অয়ন ব্যানার্জী আর শ্রীমতি ধ্রুবা দাশগুপ্ত সমীক্ষার কাগজপত্র পরীক্ষায় আর রিপোর্ট লেখায় হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করেছেন, মাথা দিয়েছেন। এছাড়া অভিজিত ঘোষ এবং মিঠুন মন্ডল খুব কাজের কাজ করেছেন। এরা দুজন সবচেয়ে বেশি মাঠে মাঠে ঘুরেছেন এবং তাঁদের সাথে সদা সর্বদা সঙ্গে থেকেছেন গঙ্গাধর মাহাতো। অর্থ এবং কিছু প্রশাসনিক আনুকুল্য সেচ দপ্তরের।